গণঅভ্যুত্থান

প্রশ্ন-১. গণঅভ্যুত্থান কী?

উত্তর: গণঅভ্যুত্থান হলো সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও জোরালো প্রতিবাদ, যা অন্যায়, শোষণ বা অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। এটি মূলত জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, বঞ্চনা ও অবিচারের ফল। এই ধরনের আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, চাকরিজীবীসহ নানা শ্রেণির মানুষ একত্র হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে। অনেক সময় এ ধরনের অভ্যুত্থানে সুসংগঠিত নেতৃত্ব না থাকলেও, মানুষের সম্মিলিত শক্তিই মূল চালিকাশক্তি হয়। এর লক্ষ্য থাকে অন্যায় নীতির পরিবর্তন, শাসকের পদত্যাগ বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে দেয়। এটি জনগণের শক্তির প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন-২. **বিপ্লব** ও গণঅভ্যুত্থানের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর:

১। উদ্দেশ্যের দিক থেকে পার্থক্য:

বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ, রাষ্ট্র বা অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুরোপুরি বদলে ফেলা। বিপ্লব সাধারণত একটি আদর্শভিত্তিক বৃহৎ পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। অন্যদিকে, গণঅভ্যুত্থান সাধারণত কোনো বিশেষ অন্যায়, দমননীতি বা শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থকে সৃষ্ট হয়। এটি সবসময় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে চায় না, বরং একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান চায়।

Created in Master PDF Editor

২। নেতৃত্ব ও সংগঠনের দিক থেকে পার্থক্য:

বিপ্লব সাধারণত সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়, যেখানে একটি রাজনৈতিক দল বা আদর্শবাদী গোষ্ঠী নেতৃত্ব দেয়। গণঅভ্যুত্থান অনেক সময় হঠাৎ করে ঘটে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংগঠিত হয়। এখানে নেতৃত্ব সবসময় সুসংগঠিত নাও হতে পারে।

৩। পরিবর্তনের গভীরতা:

বিপ্লব স্থায়ী ও মৌলিক পরিবর্তন আনে, যেমন সরকার ব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো বা অর্থনীতির ধরণ পাল্টে যায়। গণঅভ্যুত্থান অনেক সময় সাময়িক পরিবর্তন আনে, যেমন একজন শাসকের পতন বা নীতির পরিবর্তন। তবে এর ফলাফল বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

৪। উদাহরণের দিক থেকে পার্থক্য:

ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব ছিল মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো পাল্টে দেওয়ার বিপ্লব। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে।

৫। সময়সীমা ও প্রভাব:

বিপ্লব সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং এর প্রভাব অনেক গভীর হয়। গণঅভ্যুত্থান অনেক সময় অল্প সময়ের জন্য হলেও দ্রুত প্রভাব ফেলে এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল আনে।এইভাবে দেখা যায়, বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থান দুইটি ভিন্ন প্রক্রিয়া হলেও, গণঅভ্যুত্থান কখনো কখনো বিপ্লব সূচনা ঘটাতেও পারে।

Created in Master PDF Editor

প্রশ্ন-৪. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি/কারণ/প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

উত্তর:

স্বায়ত্তশাসন প্রদানে পাকিস্তান সরকারের অনীহা

- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে নেতিবাচক মনোভাব দেখায়।
- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানের দাবি উত্থাপন করে।
- স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ১৯৫০ সালের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষে গঠিত মৌলিক নীতিমালা কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রস্তাবটিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয় এবং প্রদেশসমূহকে কার্যকর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়।
- এ প্রস্তাবের বিপক্ষে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে মৌলিক নীতিমালা কমিটি বিরোধী আন্দোলন। ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কমিটির সুপারিশমালার ওপর পরিষদের আলোচনা স্থগিত রাখে।

ভাষার প্রতি অবজ্ঞা

- সরকার ১৯৪৮ সাল থেকে বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। এ সময় থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষনা করা হয়।
- তখন থেকে পূর্ব বাংলায় সরকার বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হয়।
- এসময় পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো বাঙালিদের কঠোর আন্দোলনের মুখোমুখি হয়। এই আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত বাঙালির বিজয় সূচিত হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।
- অপরদিকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার তথা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করে।

Created by Editor

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ

- বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে।
- যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৫ সালের ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন চালু করেন।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হলেও নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করে।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অবহেলা

- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। বিভিন্ন দিক থেকে এ সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়।
- কিন্তু ১৯৫৬ পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় দলবদলের প্রেক্ষাপটে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কোনো জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

সামরিক শাসন জারি এবং দমন নীতি

- আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তিন বছর পর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিন বছর পরও তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব তথা নির্যাতন ও গ্রেফতারী নীতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল ও সর্বসাধারণকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।
- এমনি মুহূর্তে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
- এটাই আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৬০-এর দশকে আইয়ুব বিরোধী ঘটনাবহুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
- ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এভাবেই শুরু হয় বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন।

১৯৬২ সালের সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন

- ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকারের বিষয়টি দারুণভাবে উপেক্ষিত এবং দেশে কঠোর একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- এই নতুন সংবিধান বাতিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ওইদিন পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৪ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।
- অবশেষে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ৮

৬-দফাভিত্তিক বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা

- পূর্ব বাংলার জনগণ ৬-দফা দাবি আদায়ের লক্ষে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আইয়ুব খান আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলে এর প্রতিবাদে ৭ জুন দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। ওইদিন সর্বাত্মক আন্দোলনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হয় এবং শত শত আহত হয়। এতেও সরকার ক্ষান্ত হননি। ১৬ জুন বাঙালির মুখপাত্র ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইত্তেফাকসহ কতিপয় পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়।
- সরকারের এরূপ নির্যাতনের প্রতিবাদে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। ছাত্র-জনতা দুর্বার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এভাবে ১৯৬৬ সালের পরবর্তী আন্দোলন ৬-দফাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এবং ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ লাভ করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন

- সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক সদস্য ও নেতার বিরুদ্ধে 'আগরতলা মামলা' নামক মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় অর্থ ও অস্ত্র নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষে ভারতের আগরতলায় আগের বছর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অভিযোগের পক্ষে কতগুলো দলিলপত্র দায়ের করা হয়। গ্রেফতারের পর তাদেরকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বিচার শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নিঃশর্তভাবে মামলা বাতিল ঘোষিত হয়।
- মামলার প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস এবং ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ১৯৬৮ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণঅভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে এবং এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

অসহযোগ আন্দোলন

প্রশ্ন-১. অসহযোগ আন্দোলন কী?

উত্তর:

অসহযোগ আন্দোলন হলো এমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, যেখানে জনগণ কোনো শাসনব্যবস্থা বা সরকারের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু তা হয় **সহিংসতা ছাড়া**, শান্তিপূর্ণভাবে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ কর দেওয়া, সরকারি অফিসে কাজ করা, আদালত বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, যেন শাসকের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মার্চ মাসে যেটি শুরু হয়, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় অসহযোগ আন্দোলন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাক সরকারকে আর স্বীকৃতি দেয়নি, যা সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়।এটি ছিল বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

Created by Editor

প্রশ্ন-২. অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি?

উত্তর:

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৭ টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮ আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সঙ্গত কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে।

- ১৯৭১ সালের মধ্য জানুয়ারিতে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে তিনদিন ধরে শেখ মুজিবের সাথে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করেন।
- জুলফিকার আলী ভুট্টোও ২৭-২৯ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

এসব আলোচনার পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

- এ ঘোষণা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার বিষয়ে নতুন চক্রান্তে মেতে উঠে।
- আর এ চক্রান্তের প্রেক্ষিতেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ করাচি থেকে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এরই প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। অতঃপর ৩ মার্চ অপরাহ্ন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টনের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। বস্তুত ইয়াহিয়া কর্তৃক ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার মধ্য দিয়েই ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বাস্তব পটভূমি প্রস্তুত হয়।

প্রশ্ন-৩. অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য?

উত্তর:

অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য

পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা নির্বাচনি ফলাফল অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করাই ছিল ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য। তবে প্রধানত দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। যথা—

1. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটানো
2. ১৯৬৬ সালে উত্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

Created in PL Editor

গণহত্যা

প্রশ্ন-১. গণহত্যা কী?

উত্তর:

গণহত্যা কী?

- গণহত্যা একটি ঘৃণ্যতম শব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হত্যাযজ্ঞের কারণে বিশ্ব শিউরে ওঠে এবং জাতিসংঘ ১৯৪৬ সালে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে।
- এ আইনে দোষী প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীকে শাস্তি ভোগের কথা উল্লেখ আছে। ১৯৪৮ সালে প্রণীত এবং ১৯৫১ সালে কার্যকর এ আইনে গণহত্যার সংজ্ঞায় বলা হয় জাতিগত, জাতীয়তাগত, গোত্রগত বা ধর্মগত কোন গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যে কোন আচার আচরণ গণহত্যার সামিল হবে:

১. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা,

২. গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের মানসিক বা শারীরিক ক্ষতি সাধন,

৩. গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের জীবনধারণে বাধা সৃষ্টি,

৪. গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের বংশ বৃদ্ধিরোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ,

৫. গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের বলপূর্বক অন্য গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর।

Created in Master PDF Editor

প্রশ্ন-৩. অপারেশন সার্চলাইটের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর:

অপারেশন সার্চলাইটের উদ্দেশ্য

এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল-

১. ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর গুলিতে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার ও প্রয়োজনে হত্যা,

২. সামরিক, আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ,

৩. অস্ত্রাগার, রেডিও ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ প্রদেশের সামগ্রিককর্তৃত্ব গ্রহণ এবং

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন-৬. অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গণহত্যার বিবরণ দাও

উত্তর:

অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গণহত্যার

- মূল পরিকল্পনায় ছিল রাত ১.০০টা থেকে অপারেশন চালানো হবে। কিন্তু পথে বিলম্ব হবে ভেবে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১১.৩০ টার সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।
- প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সঙ্গে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে।
- উল্লেখ্য যে, অপারেশন ২৫ মার্চ শেষলগ্নেব শুরু হলেও ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পড়ে যায়। রাত ১.৩০ টার সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল), জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালায় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন।
- ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, গণকটুলী, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। একইভাবে দেশের অন্যান্য জায়গায় গণহত্যা শুরু করে।

মুজিবনগর সরকার

প্রশ্ন-৫. মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য? ।

উত্তর:

মুজিবনগর সরকার গঠন এর উদ্দেশ্যে

- স্বাধীনতার ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করা।
- মুক্তিযুদ্ধকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা।
- দেশকে দ্রুত হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা।
- মুক্তিযোদ্ধাদের সুসংঘটিত করা ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- শরনার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা।
- বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ্যে সমর্থন সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন-৭.বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা

উত্তর:

বহির্বিশ্বে তৎপরতা

- বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। কারণ এ ধরনের তৎপরতার ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকবাহিনীর ধর্ষণ, নির্যাতন ও গণহত্যা সর্ম্পকে জানতে পেরেছিল।
- মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির প্রতি বিশ্বব্যাপী যে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতারই ফল। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন, কূটনৈতিক তৎপরতা, প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভের চেষ্টা, বিদেশে তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি ছিল বহির্বিশ্বে তৎপরতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- তবে এসব তৎপরতার ক্ষেত্রে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্ক ও লন্ডন দূতাবাসের প্রধান। তাছাড়া বহির্বিশ্বে তিনিই ছিলেন মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত।

Created by Me Editor

- বহির্বিশ্বে তৎপরতার ফলে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা শরণার্থী সমস্যা নয়, বরং এটা ছিল শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম।
- চীনের বাধার কারণে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বক্তৃতা করতে না পারলেও এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসি বাঙালির স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পেরেছিল।
- এমনকি সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে জনমত গড়ে উঠেছিল সে জনমতের চাপে পাক শাসকবর্গ শেখ মুজিবের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
- সর্বোপরি বাংলাদেশ ও বাঙালির সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন ও আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতারই ফল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

প্রশ্ন-১.গেরিলা যুদ্ধ কী?

উত্তর: গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বন-জঙ্গল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধে জয় ও মোকাবেলা করার জন্য সামরিক বাহিনীকে অনেকরকম সামরিক কৌশল ব্যবহার করে, যেমন অতর্কিত আক্রমণ, হানা, ক্ষুদ্র যুদ্ধ, হিট এবং রান কৌশল, ইত্যাদি।

২৬ মার্চ থেকে বাঙালি যুবক, তরুণ, ইপিআর (East Pakistan Rifles), সেনাবাহিনী ও পুলিশের অপরিকল্পিত প্রতিরোধ জুন মাস থেকে সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধের ফলে সুসংগঠিত হয়। ভারত থেকে আগত ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালালে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৬.অপেরাশন কিলো ফ্লাইট কী?

উত্তর: ৩. বিমান বাহিনীর আক্রমণ (অপারেশন কিলো ফ্লাইট): পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার লক্ষ্যে বিমানবাহিবনী বৈমানিক অভিযান পরিচালনা করে। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই সমন্বিত অভিযান গুলো অপারেশন কিলো ফ্লাইট নাম পরিচিত।

Created by Master Editor

প্রশ্ন-৭.অপেরাশন কিলো ফ্লাইটের প্রস্তুতি, পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত ও ফলাফল আলোচনা কর।

উত্তর:

অপারেশন কিলো ফ্লাইটর প্রস্তুতি: ভারত সরকারের দেওয়া বিমানগুলো বেসামরিক হওয়ায় সেগুলোকে সামরিক বিমানে পরিণত করার কাজ শুরু হয়, যা ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ অটার প্লেন এবং অ্যালুয়েড হেলিকপ্টারে পাখার নিচে সংযোজন করা হয় ২টি করে রকেট পড। এ রকেট পডগুলোতে ৭টি করে মোট ১৪টি রকেট বহন করা যেত। একইসঙ্গে এই ২টি বিমানে ছিল ভারি মেশিনগানের ব্যবস্থা। অটার বিমানের তলদেশে ২০ পাউন্ড ওজনের ২০টি বোমা বহনের ব্যবস্থা করা হয়।

ডাকোটা বিমানটিকে ১ হাজার পাউন্ডের মোট ৫টি বোমা বহনের উপযুক্ত করা হয়। ঠিক করা হয়, প্রতিটি বিমানেই থাকবেন ৩ জন করে পাইলট। এর মধ্যে ১ জন স্ট্যান্ডবাই। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোনো পাইলট আহত বা অসুস্থ হলে তখন তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। একইসঙ্গে থাকবেন একজন করে গানার। কিন্তু বেসামরিক বিমানগুলোকে সামরিক বিমানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ছিল নানা বিপত্তি।

অপারেশন কিলো ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত: কিলো ফ্লাইটের অপারেশনগুলো রাতে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ ও নিরাপত্তা বিবেচনা। দিনে আক্রমণ চালালে পাকিস্তানের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হতো অপারেশন কিলো ফ্লাইটকে। তাই মধ্যরাতে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

কিলো ফ্লাইটের অপারেশনগুলো রাতে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ ও নিরাপত্তা বিবেচনা। দিনে আক্রমণ চালালে পাকিস্তানের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হতো অপারেশন কিলো ফ্লাইটকে। তাই মধ্যরাতে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

অপারেশন কিলো ফ্লাইটর ফলাফল: কিলো ফ্লাইটের এই ২টি অপারেশনে ধ্বংস হয়ে যায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বেশিরভাগ জ্বালানি তেল। ফলে জ্বালানি তেলের অভাবে উড়ার শক্তি অনেকটাই হারিয়ে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনী। অনেকাংশেই মুক্ত হয়ে যায় বাংলার আকাশ। প্রথমদিকে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের ঘাঁটি ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে থাকলেও পরে তা শমসেরনগরে স্থানান্তর করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী ১৩ দিনে অপারেশন কিলো ফ্লাইটের মাধ্যমে অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার ও অটার বিমান নিয়ে ৭০টি অপারেশন চালিয়েছিলেন কিলো ফ্লাইটের মুক্তিযোদ্ধারা।

Created by Editor

প্রশ্ন-৮.মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য অপারেশন কিলো ফ্লাইট কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

উত্তর: অপারেশন কিলো ফ্লাইট মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পেছনে একটি গর্বের ও সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান ছিল। নিচে এর কিছু সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

⇒ বাংলাদেশের প্রথম বিমান হামলা এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রথম বিমান হামলা, যা মুক্তিবাহিনীর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

⇒ পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে সফলভাবে বোমা ফেলা হয়।

⇒ মনোবল বৃদ্ধি মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজয়ের আশা ও সাহস অনেক বেড়ে যায়।

⇒ আন্তর্জাতিক বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে এটি দেখায় যে, বাংলাদেশ একটি সংগঠিত ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হয়ে উঠছে।

⇒ পাক বাহিনীর ভীতি এই অপারেশন পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে এবং তাদের মনোবল দুর্বল করে।

⇒ এই সাহসী অপারেশন মুক্তিযুদ্ধে মানসিক ও কৌশলগতভাবে বড় অবদান রাখে।

Created in Master PDF Editor

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

প্রশ্ন-২. যুদ্ধশিশু কারা?

উত্তর:

যুদ্ধশিশু

যুদ্ধশিশু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাবস্থার সুযোগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার পর বাঙালি মহিলারা যেসকল শিশুর জন্ম দেন, তাদের যুদ্ধশিশুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের অবজ্ঞা করে 'অবাঞ্ছিত শিশু', 'শত্রু সন্তান', 'অবৈধ সন্তান' বলা হতো।

এদের জন্মদাত্রী মায়েরা 'ধর্ষিতা রমণী', 'অপমানিতা রমণী', 'দুঃস্থ মহিলা', 'ধর্ষণের শিকার', 'সৈন্যদের নিপীড়নের শিকার', 'ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা' এবং 'ভাগ্যবিড়ম্বিতা' এমন বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত হতেন। সমাজে কলঙ্কের ভয়ে অনেক জন্মদাত্রী মা আত্মহত্যা করেন, অনেকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গর্ভপাত ঘটাতে কিংবা সন্তান জন্ম দিতে অন্যত্র চলে যান এবং অনেক শিশুর জন্ম হয় মায়ের নিজ বাড়িতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কতজন মহিলা এহেন দুর্গতির শিকার হন সে বিষয়ে সঠিক বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কোনো উপাত্ত পাওয়া যায় নি। এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধশিশুদের সংখ্যা ও ভাগ্য সম্পর্কে অনুমান নির্ভর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রশ্ন-৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান আলোচনা কর।

উত্তর:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান

১. অস্ত্র হাতে নারী: যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এগিয়ে এসেছিল। অনেক যায়গায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। পুরুষদের মত তারাও নিজেদের জীবন নিয়ে ভীত হয়নি। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অনেকে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছিল। এভাবে তারা দেশের জন্য মৃত্যুকে পরোয়া করেনি।

২. সংগ্রামে নারী: একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ, মিছিল মিটিং ও সেমিনারের আয়োজন করেছিল। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গান ও নাটক রচনা করেছিল।

৩. দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ: বাংলার নারীসমাজ দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত করেছে। প্রায় দুই লক্ষ নারী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। অনেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের বাঙ্গালি দোসরদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

৪. তথ্য আদান-প্রদানে নারীরা: যেকোনো যুদ্ধের সময় তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। তথ্য যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। এই গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নারীরা দক্ষতার সাথে পালন করেছে। এক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জের নারীরাও পাকবাহিনী ও রাজাকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে খবরাখবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছিল।

৫. জনমত গঠন: মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে অনেক স্বাধীনতাকামি নারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। মিসেস বদরুন্নেছা আহমেদ, বেগম রাফিয়া আক্তার, মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম মালেকা বেগম, আয়েশা খানম প্রমুখ এই দায়িত্ত পালন করেছেন। এর পাশাপাশি ভারতীয় নারী, লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশী এবং অনেক বিদেশী নারী সাংবাদিক জনমত গঠনে কাজ করেছিল।

৬. গণবাহিনী ও গেরিলা যুদ্ধ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি গণবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে সরাসরি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। নারীরা বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে সরাসরি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুসেনাদের গাড়িতে, গানবোটে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

---

৭. মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা: যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না, খাদ্য সংগ্রহ ও অস্ত্র সরবরাহকারিণী হিসেবে নারীর ভূমিকা ছিল উলেখযোগ্য। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের শোবার ঘরে, বাথরুমে গোসলখানায় লুকিয়ে রেখে পাক সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। কখনো কখনো মুক্তিযোদ্ধাকে স্বামী বা নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করছেন। অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আহারের ব্যবস্থা করতেন।

৮. মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা প্রদান: যুদ্ধের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। সেসব মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার জন্য নারীরা এগিয়ে এসেছিল। এক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে হাসপাতাল ও ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এসব চিকিৎসাকেন্দ্রে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছিল।

৯. যুদ্ধে অনুপ্রেরণা দান: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নারীরা নিজ বাড়ির ছেলেদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের অনেক মা তার একমাত্র অবলম্বন উপযুক্ত ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। এমনিভাবে বোন তার ভাই, স্ত্রী তার স্বামীকে অনুপ্রাণিত করে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য।

১০. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারীদের ভূমিকা: মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণের অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে আস্থা অর্জন করেছিল এবং এর সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শব্দ সৈনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ পাঠিকা, লেখিকা, নাট্যকর্মী ইত্যাদি সংস্কৃতি অঙ্গনের অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন যার মধ্যে অনেকেই নারী ছিলেন।

---

১১. অস্ত্রহাতে প্রশিক্ষণ: নারী সমাজের সদস্য প্রাণশক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত করার জন্য তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, ত্রাণমন্ত্রী কামারুজ্জামান হেনা ও জাতীয় পরিষদ সদস্য সাজেদা চৌধুরীর প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধা নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নেন এবং সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

Created : Editor

১২. তহবিল সংগ্রহ: অনেক নারী সেবার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময় তহবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা পালন করেন, কেউ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এভাবে তারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

১৩. নির্যাতন ভোগ: মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এদেশের নিরীহ বাঙালি নারীদের পাকবাহিনী কর্তৃক বর্বরোচিতভাবে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হওয়া দেখে সর্বস্তরের জনগণ পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদরদের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে। এই ঘৃণা থেকে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ সংগঠিত হয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৪. স্বাধীনতার পক্ষে গান: বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে যোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা এবং সক্ষম নর-নারীদের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে তোলার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। **শাহনাজ রহমতুল্লাহ এর কণ্ঠে, 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা, কল্যাণী ঘোষের পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে।'** এমন অজস্র গানের সুর শুনে মানুষ দুঃখকে শক্তি বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশ রক্ষার সংগ্রামে।

১৫. পাকবাহিনীকে ভুল তথ্য প্রদান: মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শে অনেক নারীরা পাকবাহিনীদেরকে ভুল তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তৈরী করা ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। যখন পাক বাহিনীরা ঐ নারীর কথা শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের আগে থেকে ঠিক করে রাখা ফাঁদে পা দিত তখন মুক্তিযোদ্ধারা "হিট এন্ড রান" প্রক্রিয়ায় আক্রমণ করত।

১৬. মুক্তিযুদ্ধের দুই নারী নক্ষত্র: ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা সেক্টর-২ এর অধীনে সেখানের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। তাকে নিয়মিত আগরতলা থেকে ঔষধ আনার কাজ করতে হতো। হাসপাতালে একটি অপারেশন থিয়েটার ছিলো। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, বাঙালি ছাড়াও সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজন চিকিৎসাসেবা নিত। যুদ্ধের সময় আঁচলে হ্যান্ড গ্রেনেড বেঁধে ঘুরতেন ক্যাপ্টেন ডা: সিতারা বেগম। এছাড়াও তারামন বিবি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার রান্নার কাজে ক্যাম্পে আসলেও মুহিব হাবিলদার নামে এক মুক্তিযোদ্ধা তার সাহসিকতা দেখে সশস্ত্র যুদ্ধে নামিয়ে দেন। পরবর্তীতে সেতারা বেগম ও তারামন বিবি দুইজনেই "বীর প্রতীক" উপাধি পেয়েছেন।

Created by Editor